BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -1, Issue-2, 2019
pp. 26-39

দিনের রশিতে গিটঠু : ব্রাত্যজনের দ্রোহকথা

রামী চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম-৭৮৮০১১, ভারত
ই-মেইল : ramichakraborty12@gmail.com

সারসংক্ষেপ

মুক্তিযুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলে আখ্যায়িত করতে চেয়েছিলেন ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন। এই 'জন' বলতে কাদের বোঝায় এ প্রশ্নের নিরপেক্ষ জবাব হওয়া উচিত আপামর জনসাধারণ অর্থাৎ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, সব বয়সের নারী পুরুষের সমান উপস্থিতি। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এবং চিন্তাচেতনায় প্রভাবিত ইতিহাস তথা সাহিত্য সবসময়ই একপেশে নির্বাচনে নারীকে তার যোগ্য অবস্থান এবং মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে এসেছে চিরকাল। তাই ইতিহাসে যেমন নারীর কর্মযজ্ঞের দলিলের অন্তর্ভুক্তি ঘটেনি তেমনি সাহিত্যেও সমর্থিত হয়নি এদের স্বাতন্ত্র্যের আখ্যান। আর যেটুকু হয়েছিল তা ছিল পিতৃতন্ত্র কথিত, নির্দেশিত এবং সমর্থিত। কিন্তু তবুও সময়ের উজানে কথার পরম্পরা এগিয়ে চলে। অলক্ষ্যে ঘটে যাওয়া নারীর নিজস্ব বয়ানে উঠে আসে তাদের অলিখিত ইতিহাস। সময়ের প্রবহমানতায় হাজারো বাধা সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত হয় 'দিনের রশিতে গিটঠু'-র মতো উপন্যাস। সহস্র নারীর অন্তঃস্বরে ইতিহাস আর সাহিত্য একাকার হয়ে যায়।

বীজশব্দ

মুক্তিযুদ্ধ, নারীর অন্তঃস্বর, ইতিহাস, অন্তর্বয়ন

উদ্দেশ্য

ইতিহাস যখন সাহিত্যের বিষয় হয়ে ওঠে তখন দু'য়ের যৌক্তিক পারম্পর্যের প্রয়োগে লেখককে সাবধানী প্রহরীর ভূমিকা নিতে হয়। লেখকের দ্রষ্টা চক্ষুকে সর্বদা জাগিয়ে রাখতে হয় যেন একটি অপরটিকে আচ্ছন্ন না করে ফেলে। এ উপন্যাসে একদিকে যেমন 'মুক্তিযুদ্ধ' এর মতো একটি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে আখ্যান রচিত হয়েছে, ঠিক তেমনি সমান্তরালভাবে সমাজে নারীর অবস্থান মর্যাদা ইত্যাদি নিয়েও স্বাতন্ত্র্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। নারীকে যুদ্ধ করতে হয় তার বহির্জগত তথা অন্তর্জগতের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেও। কখনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের সরাসরি উপস্থাপনে তো কখনো সাহিত্যের শর্ত মেনেই কিছুটা পরিবর্তিত পরিচয়ে এ উপন্যাসে নারীর মৌলিক অবস্থানকে নানা ভূমিকায় চিহ্নিত এবং বিশ্লেষণের প্রয়াসই এই প্রবন্ধ।

বিশ্লেষণ

> 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একটি জনযুদ্ধ। জনযুদ্ধে সম্পৃক্ত হয় দেশের আপামর মানুষ। ব্যাপক জনগোষ্ঠীর দুঃখ কষ্টের অনুষঙ্গ যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। সে কারণে জীবন ও যুদ্ধ সমান্তরাল হয়ে যায়। সেটি সৃজনশীল সাহিত্যের উপাদান হিসেবে আর দুরূহ থাকে না। তখন তা যে কোনো লেখকের জীবনের কাহিনী হিসেবে প্রস্ফুটিত হয় বিকশিত হয় সৃজনশীলতার সৌন্দর্যে, কাঠিন্যে, রঙে এবং আকারে।'[১]

মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে এরকমই মন্তব্য করেছিলেন স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন। বাংলাদেশের হয়ে ওঠার যে প্রক্রিয়া, যে ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ সেই সময় পরিসরের ঐতিহাসিক স্বাক্ষর। বাংলাদেশের সাহিত্যে তাই মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে প্রত্যয়-প্রত্যাশার বয়ান যেমন রচিত হয়েছে, ঠিক তেমনি অনভিপ্রেত হতাশার উচ্ছ্বাসও কম বর্ণিত হয়নি। সেটাই স্বাভাবিক। দেবেশ রায় তাঁর উপন্যাস বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ 'উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে' গ্রন্থটিতে বলেছিলেন, 'সমকালকে ধরতে না পারলে উপন্যাস বাঁচে না, আবার সমকালকে ধরেও উপন্যাস বাঁচে না। সময়ের কাছে দায়বদ্ধ বলেই ঔপন্যাসিক লেখেন, ...'[২]

কথাটির অন্তর্নিহিত মূল্যটাকে বুঝতে চাই একজন নিবিড় পাঠক হিসেবে। সময়ের প্রহরী হিসেবে, সত্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বাস্তবের রূপকার হিসেবে একজন ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট তাহলে কী বা কতটুকু? শুধুমাত্র 'সমাজ, সময় আর ইতিহাসধৃত ব্যক্তিমানুষের' যাপিত জীবন। প্রাবন্ধিক দেবেশ রায়ের কথার অনুসরণে বলা যায় যেখানে সময়, সমাজ আর ইতিহাসের প্রাধান্য বেড়ে যায়, সেখানে ব্যক্তিমানুষ অবাধ চলার পথে হোঁচট খায়। ফলে সময় আর মানুষের মধ্যে সঙ্গতি বিধান করে চলাটাকেই একজন ঔপন্যাসিকের 'শিল্পগত জরুরি প্রশ্ন' বলতে চেয়েছেন প্রাবন্ধিক। এই একই দৃষ্টিভঙ্গিগত ভাবনার বিস্তার থেকেই কোনও একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে রচিত উপন্যাস কিংবা সাহিত্যের যেকোনও মাধ্যম সম্পর্কে পাঠকের মনে প্রত্যয়-প্রত্যাশা কিংবা নিরাশার বোধটিও জেগে ওঠে। এক একজন পাঠকের কাছে তার নিজস্ব অনুভবের দৃষ্টিতে এক একটি লেখা হয়ে উঠবে 'সব পেয়েছির দেশ' এমনটাই অভিপ্রেত থাকে। একজন লেখকও সেই অনুভবের জগতকেই ধরতে চান, তবে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিতে। 'সময়ান্বিত ব্যক্তি'-র আবিষ্কারক যেহেতু লেখক নিজেই তাই তাঁর উপস্থাপনার করণ-কৌশলও ভিন্ন। এখানেই লেখক এবং পাঠকের পাঠজাত দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন বলে মনে হয়। প্রত্যাশা-নিরাশার দিগন্ত তৈরি হয়। সেলিনা তাই বলেন,

> 'নিজের প্রতি সৎ থেকে নিজের অনুভবকে শক্ত মেরুদণ্ড দেওয়া লেখকের কর্তব্য। তিনি যেন কখনো পরগাছা না হন, অন্যের ইচ্ছে অনিচ্ছের দাসত্ব স্বীকার না করেন। জনপ্রিয়তা ভালো লেখকের বিবেচনার বিষয় নয়। রাজনৈতিক কমিটমেন্ট লেখকের মানসিক আশ্রয়। মানবিক উচ্চারণ লেখকের প্রাথমিক শর্ত, দেশকাল তাঁর জীবনযাপনের অষ্টপ্রহর যন্ত্রণা। এতোকিছুর পরও শর্ত ভালো লেখা- বিপ্লবী দায়িত্ব ভালো লেখা।'[৩]

এই ভালো লেখার বৈপ্লবিক শর্ত পালনের দায় থেকেই সেলিনা লেখেন। তাঁর লেখার বিষয় বিচিত্র। সাধারণ থেকে অসাধারণ, খেটে খাওয়া মানুষের রোজনামচা তথা মধ্যবিত্ত জীবন, মুক্তিযুদ্ধ দেশভাগ, আবার সমকালকে চিরকালের সঙ্গে একসূত্রে গেঁথে দিয়ে মিথের পুনর্বয়ানেও সেলিনার

লেখনী প্রাক্-আধুনিক সাহিত্যের উপাদান খুঁজে বেড়ায়। যিনি বলেন 'আমার একহাতে লেখালেখি, অন্যহাতে জীবনের বাকিটুকু' তাঁর কাছে লেখা মানে যে এক অর্থে ব্যক্তিগত তো বটেই সামাজিক দায়ও, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা এলেই নারীর প্রসঙ্গটি আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যুগের পর যুগ ধরে নানা খাতে বঞ্চিত হয়ে আসা নারীর জীবন সত্যি অর্থেই বিশ্লেষণের দাবি রাখে। সভ্যতার প্রাক্‌মুহূর্তে সব দিক থেকে সামাজিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থেকেও একটা সময় ধীরে ধীরে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াতেই সে উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে সমাজ সভ্যতার দলিল হিসেবে ইতিহাস লিখনের প্রক্রিয়া থেকেও বাদ পড়ে নারীর জীবন। কেননা ইতিহাসের স্রষ্টা এবং সৃষ্টির বিষয় পাকেচক্রে পিতৃতন্ত্রাধীন হওয়ার ফলে নারীর কোনও ভূমিকাই সেখানে লিখিত হয় না। অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরের অবলা জীব হয়েই নারীকে যাপনের অভিশাপ বয়ে নিয়ে চলতে হয় আজীবন। কিন্তু কালচক্র থেমে থাকে না। তাই নিয়ত পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় একদিন নারীকেও স্বরূপ সন্ধানের মুখোমুখি হতে হয়। সব অবরোধের পিঞ্জরকে ঠেলে দিয়ে একদিন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সবস্তরেই নারীর অংশগ্রহণ বাস্তবতার নিজস্ব শর্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু সূচনা থেকে বাস্তবায়নের যে দীর্ঘ পথযাত্রা তাকে স্বীকৃতি দিতে কোনও কালেই রাজি ছিল না এই পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন প্রশাসন, সমাজ, পরিবার কেউই। ফলে নারীর সংগ্রামের আন্দোলনের কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিত হয় না। যেটুকু পাওয়া যায় সবই বিক্ষিপ্ত এবং পুরুষের ইচ্ছা নির্ধারিত। ফলে একজন নারীকেই সেই দায়িত্ব নিতে হয়। এতে কি শুধু তার নিজস্ব বয়ানই লিপিবদ্ধ হয়? মনে হয় না, এতে ভিন্ন প্রেক্ষিতে সময়োপযোগী ঘটনার ভিন্নপাঠের সঙ্গেও আমরা পরিচিত হই। শুধুমাত্র যথাপ্রাপ্ত সাহিত্যের পুনরাবলোকন এবং পুনঃপাঠের মাধ্যমেই নারীর বিকল্প বয়ান নির্মিত হতে পারে। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসেও আমরা এক নারীর বয়ানে সেই মুক্তিযুদ্ধোত্তর একটি দেশের নারীর অবস্থানকে পাঠ করব যাদের সংগ্রামের কথা লিপিবদ্ধ হয় না দেশের সমকালীন ইতিহাসে। এক নারীর কথনে উঠে আসে হাজারো নিরক্ষর নারীর দেশভাবনার স্বতন্ত্র আখ্যান। হেলেন সিঁখো বলেছিলেন,

> 'The voice in each woman, moreover, is not only her own, but springs from the deepest layers of her psyche: her own speech becomes the echo of the primeval song she once heard, the voice of the incarnation of the first voice of the love which all women preserve alive.'[৪]

এভাবে একই স্বরের মধ্যে জেগে ওঠা অজস্র স্বরের ঐকতানেই নারীর ইতিহাসে অন্তর্ভুক্তির মহাকালীন ইশারা বিম্বিত হয়ে ওঠে।

'দিনের রশিতে গিটঠু' উপন্যাসটিতে মুক্তিযুদ্ধোত্তর দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থানের কথা তুলে ধরা হয়েছে কথক যুথিকার দৃষ্টিতে। উপন্যাসের শুরু হয়েছে একটি কাহিনি বর্ণনার মধ্য দিয়ে। রহিমুন, সিতারা আর সুলেখাকে নিয়ে আরজাতুন এবং আব্দুল হান্নান এর

সংসার। একমাত্র ছেলে আব্দুল মালেক যুদ্ধে গেছে দেশ স্বাধীনের স্বপ্ন নিয়ে। এই যুদ্ধ যুদ্ধ স্বপ্ন ধীরে ধীরে পরিবারের গণ্ডিতে বদ্ধ মেয়েদের মধ্যেও শেকড় ছড়িয়েছে। তাই সুলেখাও স্বপ্ন দেখে যুদ্ধে যাবার। শুধু তাই নয় যুদ্ধের কাজে লাগার মতো ঘটনাকে তারা পবিত্র কাজ বলে মনে করে। যুদ্ধ শুধু ধ্বংসাত্মক কোনও ঘটনা নয় এদের কাছে। যুদ্ধ এক অর্থে হয়ে উঠেছে তাদের যাপনের সঙ্গে জড়িত এক বিশেষ প্রক্রিয়া যা তাদের অস্তিত্ব সংগঠনে সাহায্য করে। যুদ্ধে মৃত্যুর কাছে রাজাকার বা পাকিস্তানী আর্মিদের আক্রমণের ভয়ও তুচ্ছ মনে হয় তাদের। তাই মৃত্যুর নিজস্ব পথ বেছে নিয়েও তারা অকুতোভয় থাকে। যুদ্ধ মুহূর্ত যেন প্রতিটি ব্যক্তিকে তার নিজস্ব যোগ্যতা অনুযায়ী তৈরি করে নেয়। কোল্লাপাথরের এই পরিবারটি সম্পূর্ণ অন্যধরনের একটি কাজে সম্পৃক্ত করেছে নিজেদের। যুদ্ধান্তে শহিদদের শান্তিতে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে এ পরিবার। আরজাতুনই এর মূল হোতা। সম্পূর্ণ নতুনভাবে স্বাধীন দেশের স্বাধীন মনের নারী হিসেবেই ঔপন্যাসিক এঁকেছেন এদের। যুদ্ধাহত ব্যক্তির যে কোনও ধর্ম হয় না, পরিচয় হয় না, তাদের একটাই পরিচয় 'ওনারা মুক্তিযোদ্ধা' এই ভাবনার শরিক কিন্তু অজ পাড়াগাঁয়ের এক নিরক্ষর নারী। নিজেই সে নিজেকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছে। তবে তাৎক্ষণিক চেতনাই তার প্রশিক্ষক। যুদ্ধকালীন পরিবেশই তার প্রশিক্ষণের কর্মক্ষেত্র।

> 'আরজাতুনের মনে হয় ও যুদ্ধের অন্য একটি ক্ষেত্রের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করছে। এখন শক্ত পায়ে দাঁড়ানোর সময়। ... আমাগো সামনে এখন মেলা কাম। কিসের কাম আম্মা? শহীদের দাফনের। মুক্তিযোদ্ধার লাশ দাফন।'[৫]

আবার তার ভাবনায় যখন ভালোবাসার যোগ্য পুরুষের কল্পনায় বিপরীতধর্মী চিন্তাও উঠে আসে,

> 'যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন বাজি রাখে, তারাই তো যোগ্য পুরুষ দু'বোনের বুকের ভেতরে ভালোলাগার শালদা নদী বয়ে যায়। কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না ভাবে, দেশের জন্য যুদ্ধ করলেই কি তারা মেয়েদের জন্যও ভালো মানুষ হবে যদি তা-ই হতো, তাহলে চারপাশের এ মেয়ের জীবনে এত দুঃখ কেন?'[৬]

তখন মনে হয়, এভাবেই বোধহয় মেয়েদের নিজস্ব উপনিবেশ তৈরি হয়ে যায় নিজস্ব নিয়মেই, চেতনায়- কর্মজগতে সর্বত্রই। লেখক স্বর আখ্যানের স্বাভাবিকতা বজায় রেখেও নারী সম্পর্কিত ভাবনায় নিজস্ব প্রত্যয়ের শরিক করে নেন পাঠককে। '… Language was always more than a cultural concern.'[৭] যুদ্ধের সাংস্কৃতিক আবহেও যে মেয়েদের জন্য সবসময় পৃথক এক যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি থাকে শুধুমাত্র নারী হওয়ার সুবাদে, লেখকের প্রত্যয়ী বাচন আমাদের এই নারীচেতনাবাদী পাঠে সংবেদী করে তোলে। প্রকৃত যোদ্ধা একজন প্রকৃত 'মানুষ' না-ও হতে পারেন। তিনি একজন পুরুষ আর তার এই পরিচয় এবং আচরণের সঙ্গেই একটি মেয়ের কাছে 'ভালো মানুষ' হওয়ার আখ্যা বিচার্য হয়ে থাকে। একজন পুরুষ স্রষ্টার বয়ানে যেখানে 'মুক্তিযোদ্ধা' এই বিশেষণের চাপে তার অন্য সব চারিত্রিক বা মানবিক খামতি ঢাকা পড়ে যেত কিন্তু নারী লেখক বলেই সেই লৈঙ্গিক

চেতনার দিকটি পৃথক ভাবে উদ্ভাসিত হয়। 'Because feminist criticism centralises 'woman' it is sociolinguistic in nature, describing woman's writing with a practical attention to the physical use of words.'[৮]

শব্দের এই আক্ষরিক ব্যবহারও আবার সময় বিশেষে ব্যঞ্জনার্থে সাংকেতিক হয়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শের চিহ্নায়নে যখন একজন নিরক্ষর অজ্ঞাতকুলশীল মাতৃসত্তাই রাজনৈতিক চেতনায় যুদ্ধে হারানো হাজারো সন্তানের মা হয়ে ওঠেন। নিজের মুক্তিযোদ্ধা সন্তান আব্দুল মালেকের নিথর দেহটি তাদের কাছে মনে হয় 'ঝাঁঝরা বুকটাই যুদ্ধক্ষেত্র'। আরজাতুনের স্তব্ধ কান্না আর বিদীর্ণ নীরবতাতেই শহিদের দাফনের ব্যবস্থা করে দেওয়া এক সামান্য নারী হয়েও সে প্রকৃত 'মুক্তিযোদ্ধা'র সম্মান অর্জন করে। 'তারপর রক্তমাখা আঁচলটা পিঠের ওপর টেনে মাথায় উঠিয়ে দেয়। ... তার মাথায় রক্তমাখা আঁচলটা পতাকার মতো উড়ছে। আরজাতুন একা নয় কোটি কোটি মানুষের একটি অবয়ব। একটি প্রতীকী ভাস্কর্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।'[৯]

সেলিনা তাঁর প্রবন্ধে বলেছিলেন যে বক্তব্যের গভীরতা এবং নির্মাণ কৌশল এই দুটি শর্তই একজন লেখকের ক্ষেত্রে সতত ক্রিয়াশীল থাকে। তাঁর কথার সূত্র ধরেই বলা যায় বক্তব্যের গভীরতা এবং নির্মাণের অভিনবত্বে মৃত শহিদ সন্তানের রক্তমাখা মায়ের আঁচলই কখন যেন ব্যক্তিগত-এর সীমানা ছাড়িয়ে স্বাধীনতার সার্বিক আকাঙ্ক্ষার সম্ভাবনার প্রতীক পতাকায় রূপান্তর ঘটেছে।

এটা আসলে মূল আখ্যান নয়। আখ্যানের ভেতরে গড়ে ওঠা আরেক আখ্যান। আলোচ্য উপন্যাসের মূল চরিত্র যুথিকার বয়ানে লিপিবদ্ধ হয়। অজস্র স্বরবিন্যাস তো উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রাসঙ্গিক হতে পারে দেবেশ রায়ের এই মন্তব্যটি,

> 'উপন্যাসের লেখকের কোনো নিজস্ব ভাষা নেই কিন্তু সমস্ত ভাষার মধ্যেই উপন্যাস লেখকের ভাষা ছাড়িয়ে থাকে। উপন্যাস বা উপন্যাস হিসেবে আমরা পাঠ করতে চাই এমন রচনাগুলিকে বিভিন্ন চরিত্রের কণ্ঠস্বরের বলয়ে বা বিভিন্ন চরিত্রের সক্রিয়তার বলয়ে আমরা ভাগ করে নিতে পারি।'[১০]

এভাবেই আখ্যানের ভিতরে আখ্যানের বহুমাত্রিক স্তর পেরিয়ে সেলিনা পৌঁছে যেতে চান মূল চরিত্রে। হয়তো এভাবেই ঔপন্যাসিক 'অতিনির্দিষ্ট অন্তর্ঘাতে'র মধ্য দিয়ে উপন্যাস রচনার মূলভাবটিকে 'অতিনির্দিষ্টতা' দিতে চান। পাঠক হিসেবে আমরাও কাহিনির নির্মোক সরিয়ে প্রচ্ছন্ন নির্যাসকে আবিষ্কার করি। প্রকৃত অর্থে গোটা উপন্যাসটিই কতকগুলো বিক্ষিপ্ত ঘটনার সমবেত দলিল। যার সূত্রধর বা কথক যুথিকা নিজেই। এই যুথিকা চরিত্রটিকেও যুদ্ধকালীন ইতিহাস থেকেই চয়ন করেছেন সেলিনা। ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকেই এই অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে জানতে পারি,

> 'বহু অনুসন্ধানের পর আবিষ্কৃত অসংখ্য নারী মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন বীথিকা বিশ্বাস ও শিশির কণা। জনকণ্ঠ পত্রিকার প্রতিবেদক মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁদের কথা লিখেছেন :

... একাত্তরের ১১ জুলাই। বৃষ্টিভেজা রাত। টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে যৈজ্ঞ কাকার নৌকায় উঠলেন দুই তরুণী। বীথিকা বিশ্বাস এবং শিশির কণা। দুজনেরই কোমরে বাঁধা হ্যান্ড গ্রেনেড। পাক আর্মি এসেছে স্বরূপকাঠিতে, বড় নদীতে নোঙ্গর ফেলেছে তাদের গানবোট। খবর চলে এলো মুক্তিবাহিনীর কাছে, ক্যাপ্টেন বেগ সিদ্ধান্ত নিলেন, গ্রেনেড চার্জ করতে হবে গানবোটে। কে যাবে? আগ্রহ দেখালেন দুই অকুতোভয় তরুণী বীথিকা এবং শিশির কণা। ... নৌকা থেকে পানিতে নেমে সাঁতার দিয়ে গানবোটের দিকে এগিয়ে গেলেন দুই তরুণী। কচুরিপানার সঙ্গে মিশে অন্ধকারে ভেসে ভেসে গিয়ে ভিড়লেন লঞ্চের গায়ে। পাশাপাশি তিনটি লঞ্চ। বাতাসে রান্নার গন্ধ ভাসছে, লঞ্চের ভিতরে পাকবাহিনীর খানাপিনার আয়োজন। বৃষ্টিটা যেন হঠাৎ করে আরও জোরে এলো। দুই তরুণী উৎকণ্ঠিত হলেন। ... শিশির কণার কাঁধে চাপ দিলেন বীথিকা, এখনই সময়, আর দেরী করা যাবে না। দাঁতে গ্রেনেডের রিং কামড়ে ধরলেন বীথিকা, টান দিয়ে ছুঁড়ে মারলেন গ্রেনেড। শিশির কণার হাত থেকেও ছুটে গেল গ্রেনেড। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পাকবাহিনীর গানবোট। ... তারপর বীথিকা আর শিশির কণা জীবন্মৃত অবস্থায় অন্ধকারে লঞ্চের আড়ালে ভেসে ছিলেন। ... অনেকক্ষণ পর অন্ধকারে কচুরিপানার নিচ দিয়ে সাঁতারে তীরে ফিরলেন। অন্ধকারে হেঁটে এক সময় পৌঁছে গেলেন মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে। বীথিকা বিশ্বাসের বয়ানে সংক্ষেপে এই হচ্ছে অপারেশন স্বরূপকাঠির কাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের এই অজানা যোদ্ধা তুলে ধরলেন মুক্তিযুদ্ধের সেই চাপা পড়া অধ্যায়, রণাঙ্গনে বাংলার নারীদের অবিশ্বাস্য সাহসিকতার কাহিনী।'[১১]

পিরোজপুরের আটকুড়িয়ানা গ্রামের বাসিন্দা বীথিকা বিশ্বাসই এই উপন্যাসের কথক যুথিকা। উপন্যাসের বয়ান সেই সাক্ষ্যই দেয়। এই যুথিকার মাধ্যমেই লেখিকা যুদ্ধোত্তর দেশের সামাজিক পরিস্থিতিতে নারীর অবনমনের চিত্র তুলে ধরেন সে সঙ্গে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার মিশেলে উপন্যাসের কথাবস্তু নির্মিত হয়।

'মুহূর্ত সময় মাত্র। লঞ্চের ইঞ্জিন স্টার্টের ঘর্ঘর শব্দ শুরু হয়েছে। দু'জনে গ্রেনেডের রিং দুটো দাঁতে কামড়ে ধরে এবং ফিতাটা টান মেরে ছুঁড়ে মারে সঙ্গে সঙ্গে। লঞ্চের একটি অংশ প্রবল শব্দে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

যুথিকা আর রত্না খুঁটির সাথে আটকানো শেকল বেয়ে সিঁড়ির পাটাতনের একেবারে তক্তার নিচে গিয়ে সাঁতার কেটে চরের কোণায় ওঠে। কাছাকাছি ছিল যজ্ঞের নৌকা। ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলো মুক্তিযোদ্ধার দলবলসহ ক্যাপ্টেন হুদা। ভিজে পোশাকেই ক্যাপ্টেন ওদের জড়িয়ে ধরে বলে, অসাধারণ কাজ করেছো। ... তোমরা আমাদের গর্ব। তোমাদের অপারেশনের সাফল্য আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে লেখা থাকবে।'[১২]

যথার্থই বলেছেন প্রাবন্ধিক- সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী তাঁর একটি বই এর মুখবন্ধে, 'সাহিত্য জন্ম নেয় ইতিহাসের পরিমণ্ডলে। ইতিহাসও প্রায়শই নিজেকে খুঁজে পায় সাহিত্যের ভাষায় এবং ভাষ্যে।'[১৩]

সত্যিই তো, ইতিহাস-দর্শন-সমাজনীতি-রাজনীতি সবই সাহিত্যের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সংযোগ রক্ষা করে চলে। ইতিহাসের নানা অনুষঙ্গ অন্তর্বয়নে সাহিত্যের অবয়ব গড়ে ওঠে। আবার এও তো সত্যি যে নিয়ত পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিক ব্যক্তিসত্তার জিজ্ঞাসাকেও সংগঠিত করে। কেননা প্রতিটি ব্যক্তিগত উচ্চারণ এক অর্থে সামাজিক বলেই প্রতিটি সম্পর্কও সামাজিক সম্পর্ক। এই সামাজিক দায়ই এককালের মুক্তিযোদ্ধা বর্তমানে স্কুল শিক্ষিকা তথা

লেখক যুথিকাকে তাড়িত করে।

> 'ওর মনে হয় রশি ছিঁড়ে গেছে, গিটঠু দিয়ে টান দিলে সেটাও ফেঁসে যায়। ও কুঁকড়ে থাকে এবং আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করে ও এক বিশাল ডাস্টবিনে বসবাস করছে। এক অদ্ভুত ডাস্টবিনে- এখানে বেঁচে থাকার ভান আছে, নষ্টামী আছে- প্রকৃত জীবনযাপনের চিহ্ন খুবই কম- তা ব্যক্তির জীবনে যেমন কম, সমষ্টির জীবনেও তেমন কম। সঙ্গতি খুঁজে পেতে কষ্ট হয় এবং সবচেয়ে খারাপ নষ্ট রাজনীতির লীলাখেলা। এখানে নাগরালির চতুরতা যুদ্ধকালের গৌরবের সময়টুকু থেঁতলে দিয়েছে- বেশি থেঁতলেছে নারী।'[১৪]

এ যে শুধু উপন্যাসে বর্ণিত কথক স্বরের ভাবনা বাহিত বয়ান নয়, এতে বিবরণকারের নিজের স্বরে প্রচ্ছন্নভাবে মিশে আছে লেখকের চেতনা সঞ্জাত উচ্চারণ- পাঠকের অনুভবী মন তা সহজেই অনুভব করে। এক অর্থে এই স্বর কথক এবং লেখকের দু'জনেরই। উপন্যাস গড়ে ওঠে এই লেখক স্বর এবং বহুস্বরের আততিতেই, প্রাবন্ধিক দেবেশ রায় এমনটাই বলতে চেয়েছেন বাখতিনের উপন্যাস ভাবনার নির্যাস শুষে নিয়ে। একটু আগে অন্তর্বয়নের প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছিলাম। এবার পাঠকৃতিতে কীভাবে এর প্রয়োগ ঘটে বা সার্থকভাবে ঘটিয়েছেন ঔপন্যাসিক সেলিনা, তার কথা বলতে চাই। আর এর সঙ্গে জুড়ে রয়েছে যে চিরাচরিত নারীর অবদমনের ইতিহাস, সেটাও বিশ্লেষণ সাপেক্ষ।

Intertexuality বা অন্তর্বয়নের প্রসঙ্গে বাখতিনীয় ভাবনার নির্যাস নিয়ে ক্রিস্তেভা-ই ফরাসি ভাষা এবং সাহিত্যে এর প্রথম অন্তর্ভুক্তি ঘটান। The Bounded Text-এই শব্দবন্ধটির ব্যাখ্যায় ক্রিস্তেভা বলতে চেয়েছিলেন যে এটা একটা প্রক্রিয়া যেখানে এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয় যে প্রতিটি পাঠকৃতির নির্মাণই পূর্ববর্তী কোনও প্রতিবেদনের অস্তিত্ব নির্মাণের মধ্যে নিহিত থাকে। অর্থাৎ,

> 'Authors do not create their texts from their own original minds, but rather compile, them from pre-existent texts, so that, as Kristeva writes, a text is a permutation of texts , an intertexuality in the space of a given text, in which several utterances, taken from other texts, intersect and centralize one another.'[১৫]

মানে আরও একটু বিশদভাবে বলতে গেলে,

> 'Texts are made up of what is at times styled the cultural (or social) text, all the different discourses, ways of speaking and saying, institutionally sanctioned structure and systems which make up what we call culture.'[১৬]

বাখতিন এবং ক্রিস্তেভা দু'জনের ধারণা থেকেই এটা স্পষ্ট যে,

> 'texts cannot be separated from the larger cultural or social textuality out of which they are constructed.'[১৭]

এই সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অন্তর্বয়নের সূত্র ধরেই সুদূর আসামের নিকটবর্তী রাজ্য মণিপুরে ঘটে

যাওয়া রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তৃত্বের হাতে নারীর অবনমনের প্রতিবাদে বারোজন নারীর নির্বস্ত্র প্রতিবাদের বিষয়টিও যুথিকার অবচেতনে সাড়া তোলে।

> 'বারোজন মধ্যবয়সী নারী নগ্ন হয়ে ইম্ফলের কাংলা ফোর্টের আসাম রাইফেলসের সদর দফতরের সামনে ব্যানার হাতে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ... নারীর শরীর যে কতকিছুর ব্যাখ্যা দেয়- পুরুষ তাকে যে কতভাবে ব্যাখ্যা করে এটা নারীর চেয়ে বেশি আর কে জানে। ... ওরা ক্ষমতার দম্ভে বুটের নিচে মাড়িয়ে যায় মানুষের শরীর - থেঁতলে দেয় শরীর- ... আমার সামনে ভেসে ওঠে প্রতিবাদী কল্পনা চাকমার মুখ, যাকে সেনাবাহিনীর সদস্য ধরে নিয়ে যায়, সে আর কোনোদিন ফিরে আসে না। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অর্থ মৃত্যু। ... এখন মৃত্যুর মতো কঠিন সময় আমার চারপাশে। জঙ্গীবাদের উত্থান মৃত্যুকে আমার দোরগোড়ায় সেঁটে রেখেছে। কারণ যুদ্ধের সময় আমি ওদের প্রতিপক্ষ ছিলাম। এখনও ওদের প্রতিপক্ষ। অনবরত ওদের বিরুদ্ধে লিখছি। লেখাকে আমার নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করি। আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না।'[১৮]

ভৌগোলিক দূরত্ব কোনও মানে রাখে না, নারীর অবদমনের বিষয়টি যে চিরটাকাল সব পরিসরেই সমান থাকে। তবে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চিত্রটি একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে গোটা পৃথিবীতে। যুথিকার নানা দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে গোটা দেশের নারীর অবস্থানগত সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যকে একটু একটু করে গুটিয়ে আনেন নিজের লেখনীর আয়ত্তে। আখ্যান যত এগোয় আমরা লক্ষ করি এক নারীকে অনেক নারী তাদের নির্ভরস্থল করে জীবনে এগিয়ে যায়। একদিকে যেমন বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীন ভূখণ্ডে খুশী- হনুফাদের মতো নির্যাতিতরা যুথিকাকে ঘিরে নিরাপত্তার বলয় দৃঢ় করে বাঁচতে চায়, অন্যদিকে আবার 'মুক্তিযোদ্ধা' এই বিশেষণের অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া নারীদের বিস্মৃত ইতিহাসকে কুড়িয়ে আনার অনন্য সাধনে ব্যাপৃত রয়েছে যুথিকা নিজেই। স্বাধীন দেশে রাজা বদলায় শুধু, কিন্তু ক্ষমতা মুখোশ পালটে নেয়। তাই খুশি কিংবা হনুফা এদের জীবনে নির্যাতনের কোনও হেরফের ঘটে না। নারীর যুদ্ধ সবসময় দ্বিমুখী। প্রথমে তাকে লড়তে হয় চেনা ক্ষমতাসীন অর্থাৎ পারিবারিক পারিপার্শ্বিকতার বিরুদ্ধে আবার বাইরেও লড়তে হয় রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতাপের বিরুদ্ধে যা তাদের যে কোনও পরিস্থিতিতেই শিকার করে নেয়। যেকোনো যুদ্ধের সময় পরিস্থিতির শিকার হয় যত সংখ্যক নিরীহ মানুষ, বলতে বাধা নেই সমসংখ্যক নারীও সেই সময়ে পিতৃতান্ত্রিক আগ্রাসনের শিকার হয়।

যুথিকার বিদেশ সফরের সূত্র ধরে উঠে আসে নারীর হেনস্থার চিত্র। সবক্ষেত্রেই পিতৃতন্ত্রের ক্ষমতাকে ধরে রাখে যে প্রধান স্তম্ভগুলো সেগুলোই এই নির্যাতনের প্রেক্ষাপট তৈরি করে। কোথাও ধর্ম তো কোথাও আইন ইত্যাদি। চারদিকে 'উজেলি', 'মীনা'র মতো ছবি তৈরি হয়, ঢাকঢোল পিটিয়ে নারী নির্যাতনের সংবাদ পরিবেশিত হয়। হয়তো কোনও নারীই এসব কর্মকাণ্ডের হোতা হন; কিন্তু বাস্তবের কোনও পরিবর্তন ঘটে না। প্রতাপের পরিচিত শর্ত মেনে কোনও নারী যদি ক্ষমতার শীর্ষে চলে আসেন, তখন তাঁদের মধ্যেও মানবিকতার চাইতে ক্ষমতার ভারে উপেক্ষার উদাসীন দৃষ্টিই লক্ষিত হয় এসব নারীর পরিস্থিতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। এভাবে যুথিকার কলমে সত্যের দাবি নিয়েই একের পর এক বন্দি হতে থাকে যুদ্ধোত্তর নারীর জীবন। নারীর লেখার কোনও বিষয় হতে

পারে না বা উল্টো করে ঘুরিয়ে এভাবেও বলা যায় যেকোনও মুহূর্তের ঘটনাবন্দি সময়ই মেয়েদের লেখার বিষয় হয়ে ওঠে।

> '... at the present time, defining a feminine practice of writing is impossible with an impossibility that will continue; for this practice will never be able to be theorized, enclosed, coded, which does not mean it does not exist.'[১৯]

-'ecriture feminine' বা নারীর লিখন সম্পর্কে এ ধারণাই পোষণ করেন হেলেন সিঁখো।

যুথিকারও মনে হয়,-

'কি করে যে পারি আমি নিজেও বুঝি না। শুধু এটা বুঝি যে এভাবে আমি ভুবন গড়তে পারি। সময়ের ওলোটপালোট করতে পারি। আর, এমন তছনছ সময়কে ভীষণ উপভোগ করি।'[২০] লেখকস্বরও বা বলতে পারি ঔপন্যাসিকও নিজের অজান্তেই ঢুকে পড়েন বিবরণের মধ্যে, 'ভাবনা ওকে আচ্ছন্ন করে। এমন পরিস্থিতিতে ও সবসময় নিজের সঙ্গে কথা বলে। কথা বলতে বলতে নানা সময় পার করে দেয়।'[২১]

নারীর ক্ষেত্রে তো এটাই সত্যি তারা যখন লেখে, তখন নিজের সঙ্গেই অনবরত কথা তৈরি করে চলে। তার সত্তার অন্য একটি অংশই যেন তার সামনে 'অপর' হয়ে এসে দাঁড়ায়। এই নিজের সঙ্গে নিজের কথোপকথনেই কথার সৌধ তৈরি হয়। হেলেন সিঁখো বলেছিলেন,

> 'I can only try to understand, I can only work on, or take note of why and how one is knocked off one's feet, I can only ask myself what that means, if I begin by noticing it in myself, myself as the first other.'[২২]

যুদ্ধোত্তর স্বাধীন দেশে নারীর জীবন সম্পর্কে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অপরিবর্তিত আগ্রাসী মনোভাব যুথিকাকে আহত করে। তার নিজেকে অসহায় মনে হয় 'অথর্ব, মুমূর্ষু মানুষের শারীরিক কাঠামোয় আমার দিনগুলো ফ্যাকাসে বিবর্ণ'। কিন্তু তবুও সে নিজের বিক্ষিপ্ত চিন্তার সূত্রগুলো সংগঠিত করে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়। নির্যাতিত পরিবেশ থেকে উঠে আসা খুশির অস্তিত্ব, হনুফা ওরফে উজেলির নিরুজ্জ্বল পিঠ জুড়ে ভেসে ওঠা পিতৃতন্ত্রের পাশবিক নিষ্ঠুরতার চিহ্ন, নারীর ভূলুণ্ঠিত অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে ধর্মের বিচিত্র প্রহসন, - সবকিছু যুথিকার উদ্বিগ্ন সত্তাকে এক 'ডাস্টবিন' শহরের ছবি উপহার দেয়। এই নিরাপত্তাহীন শহরে প্রতিনিয়ত হারিয়ে যাওয়া খোলামকুচির মতো জীবন যাদের, সেইসব নারীদের জীবন-দর্পণে যুথিকা আসলে নিজের পরান্মুখ ব্যর্থতাকেই আবিষ্কার করে। যে শহর উজেলি খুশিদের বেঁচে থাকার স্থায়ীত্বের বদলে অস্থির রাত এনে দেয়, সরকার তার দায়িত্বের হাত নিরপেক্ষ দূরত্বে সরিয়ে রাখে, এমনকি পারিবারিক পরিসরটুকু মান বাঁচিয়ে শামুকের খোলসে মুখ লুকোয়। যুথিকার ব্যর্থতার অনুভবে ঔপন্যাসিক

স্বাধীনোত্তর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অসারতাকে ব্যক্ত করেন।

> 'জ্বলজ্বলে তারায় ভরা আকাশের কালো রঙ উজেলির মুখ হয়ে আমার দুঃখ ভোলায়। ... একটি বস্তুর আড়ালে আর একটি বস্তু হয়ে? কেন আকাশ আমার প্রিয়? আকাশে উজেলিদের মতো মেয়েরা নেই, মানুষের ছাদহীন বেড়াহীন উদোম জীবনযাপন নেই, খুদকণা শূন্য ভাতের থালা নেই। এজন্য আকাশ আমার প্রিয়। বুঝতে পারি যুদ্ধ করার সাহস নিয়েও আমি বাস্তবের মুখোমুখি হতে ভয় পাই।'[২৩]

চেনা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অনেক সহজ। কিন্তু পোশাকি স্বাধীনতার রঙিন দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে বাস্তবের স্বরূপকে। তাতে নারীর লড়াই আবার ঘরে বাইরে। যুথিকার জীবনচিত্রে ঔপন্যাসিক এক নারীর আজীবনের সংগ্রামকে তুলে ধরেন। যুথিকার জন্মের সময় তাকে ঘিরে তার বড়দিদির আত্মহত্যা, শুধুমাত্র মেয়ে বলে বড়ো হয়ে ওঠার দিনগুলোতে সমাজের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তাঁদের 'মেয়ে' জন্মটাকে উপেক্ষা করা এবং মেয়ে হয়েও 'সাহসী' বলে প্রেমিকের উদাসীন দূরত্ব রচনা এসবই যুথিকার নারীজীবনের এক একটি অন্তরায়, যা তাকে পেরিয়ে যেতে হয়েছিল।

কাঁকনবিবি, কাঞ্চনমালা, আদুরজান, নসিমুনআরা এসব সরকারি স্বীকৃতিবিহীন (তৎকালীন) মুক্তিযোদ্ধাগণ যুথিকার সংগঠিত চেতনার এক একটি স্তম্ভ যেন। যুথিকার সঙ্গে কথোপকথনে এদের অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগিয়ে ঔপন্যাসিক সেলিনা যেন নারী মুক্তিযোদ্ধাদের সাহিত্যে দলিলীকরণের সুবিশাল দায়িত্বটি নিজের কাঁধে তুলে নেন। কিন্তু একজন নারীর কলমে যখন আর এক নারীর জীবন অঙ্কিত হয়, তখন তাতে দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণেই আরো অনেক কিছু উঠে আসে। কেননা,

> 'Women speak in a sexually distinctive way from men. The experience of gender in writing and reading is symbolized in style, and style, therefore, must represent the articulation of ideology by any particular writer or critic reader.' [২৪]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কাঁকনবিবি এখন হয়তো অনেকটাই পরিচিত নাম। কিন্তু তার জীবনের অনিচ্ছা ও অন্ধকারের দিকগুলোকেই যে আমাদের আলোকময় করে তুলতে হবে। এটাই যেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চান ঔপন্যাসিক।

> 'আমার শরীরটা ছিল আমার দেশ। ওটা আমি দিয়ে দিয়েছিলাম দেশকে। যে যেখানে ধরে নিয়ে চিৎ করে শুইয়ে দিয়েছিল, আমি শুয়েছিলাম।... আমার শরীরটা বাংলাদেশ। ন্যাংটো হয়ে তোকে দেখাতে পারলে দেখতি শরীরটায় নির্যাতনের খানাখন্দ। এই শরীরটা দেখলেই মুক্তিযুদ্ধ দেখা যায়।'[২৫]

এভাবেই বোধহয় নারীর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার শিকড় ছড়িয়ে গিয়ে তার নারীত্বের গভীর উপলব্ধিকে স্পর্শ করে। তাই অনুভবের গভীরতায় ভাষাও নতুন সংরূপ গড়ে নেয়।

> 'This is because ideology is what we construct to explain our experience, and the experience of others, to ourselves. Ideology is our way of coping with the contradiction of experience.'[২৬]

নারীর অভিজ্ঞতার বয়ানে তার শরীর আর দেশ এক হয়ে যায়। তাই দেশের জন্য যুদ্ধ যে কখন তার নিজের সব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে রূপান্তর ঘটে যায়, এটা শুধুমাত্র এক নারীর কলমে নারীর অভিজ্ঞতার রূপায়নেই পাঠ করা সম্ভব। কিংবা কাঞ্চনমালা যখন তার পারিবারিক অবস্থানের কথা জানায়, তখন আমরা দেখি কত নিঃশব্দে এক নারীর কলমে দলিলীকৃত হয় বঞ্চিতা নারীর ইতিহাস। অনিচ্ছায় শত্রুপক্ষের ক্যাম্পে কাটিয়ে আসা কাঞ্চনমালার বীভৎস দিনগুলি আরো ভয়ানক হয়ে ওঠে তার পারিবারিক পরিমণ্ডলে ফিরে আসার পর। কেননা নারী তো প্রতিমুহূর্তে তার ইজ্জত হারায় তাতে তার সহমত থাকা বা না থাকা নিয়ে কেউ বিচার করে না। তবে কাঞ্চনমালার ক্ষেত্রে আমরা এক সহৃদয় পুরুষের ভূমিকাকেও অস্বীকার করতে পারি না। যার সদিচ্ছার কাছে কাঞ্চনমালার অমানুষ স্বামীর পাশবিক জেদ হার মানতে বাধ্য হয়। সে স্বামীগৃহে থাকার সুযোগ পায়। কিন্তু এই পরগৃহে কাটানো নারীর শরীরটি কিন্তু তার স্বামী নামক পুরুষটির কাছে অপবিত্র ত্যাজ্যবস্তু থাকে না। পুরুষ হওয়ার কর্তৃত্ব সে এই নারীর শরীর ভোগেই প্রমাণ করে। 'এত অন্ধকারের মধ্যে লোকটি যৌনসুখ মেটাতে ছাড়েনি। এই এক জায়গায় আমার পাপ ছিল না। সন্তানেরও জন্ম দিয়েছি।'[২৭] তবে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের মতো অপমান এই নারী মেনে নিয়ে পারেনি। তাই প্রতিবাদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।

উপসংহার

উপন্যাস যত শেষের দিকে এগোয়, ঔপন্যাসিকও তার 'অতিনির্দিষ্ট' ভাবনাকে আরও জোরালো করে তুলতে বক্তব্যকে সংহত করে আনেন। ঘুড়িকে মাঝ আকাশে উড়তে দিতে অনেকটা সুতো ছাড়তে হয়। আবার শেষে গুটিয়ে আনতে হয় একটু একটু করে অতি সাবধানে, যাতে অন্য ঘুড়ির সুতো লেগে কেটে না যায়। একজন ঔপন্যাসিকও তেমনি ঘটনার ভেতর ঘটনার বর্ণনা করতে করতে নানা কথার সংযোজনে সমে ফিরে আসার মতো করে তাঁর বক্তব্যের নির্যাসে ফিরে আসেন। আমরা দেখি যুথিকার শৈশবের স্মৃতিচারণে উঠে আসে আমাদের পরিবারে সেই শৈশবের দিনগুলি যখন থেকেই ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য করে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটি রপ্ত হয়ে যায়। ছেলেটি যেমন আশৈশব এটা ভেবেই বড়ো হয় পৃথিবীর সবকিছুতেই তার অবাধ অধিকার। পক্ষান্তরে, মেয়েটি দেখে তার গোটা জগতটাই নিষেধের বেড়াজালে ঠাসা। মানিয়ে নেওয়া মেয়েগুলো কোনও রকমে টিকে যায় আর ব্যতিক্রমী যে দু'চারজন মুখ ফিরিয়ে বসে, তাঁদের প্রতিমুহূর্তেই উল্টো স্রোতে চলার মানসিকতা এবং সাহস জুগিয়ে এগোতে হয়। আমরা যুথিকাকেও দেখেছি যে এমন একটা মিছিল বের করতে চায় যেখানে সমাজের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনালোকিত, অচর্চিত মানুষগুলো (নারী) এই মিছিলের মুখ হয়ে উঠবে।

উপন্যাসের সমাপ্তি অনেকটা প্রতীকী হয়ে ওঠে। যেখানে এক বিশাল নারী মুক্তিযোদ্ধাদের মিছিল শহর ছাড়িয়ে দেশ পরিক্রমা করে। পালা করে সবাই এর নেতৃত্ব দেয়, যারা এতদিন অন্ধ বিবরে দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু সত্যিই কি স্বাধীন দেশে নারীর অবস্থা পরিবর্তিত হয়? এই বহুমূল্য প্রশ্নটি ঔপন্যাসিক আমাদের সামনে তুলে ধরেন। ছাদের কার্ণিশ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া অনামী শিশু

কন্যাকে যখন যুথিকা এবং তার মর্ম-সঙ্গী অনিমেষ সন্তান হিসেবে পরিচিতি দেয় তখন সবচেয়ে মোক্ষম প্রশ্নটি উঠে আসে যুথিকার মন থেকে। যুথিকা অনিমেষকে বলে, 'আমরা দু'জন যুদ্ধ করা মানুষ ওকে কি স্বাধীন দেশের একটি বাঙ্কার থেকে বের করে আনলাম? যে অদৃশ্য বাঙ্কারে নারীরা এখনও প্রবলভাবে নিপীড়িত হচ্ছে? যার কোনো বিচার নেই। এখনও যেখানে নারী সমাজ কর্তৃক উপেক্ষিত।'[২৮]

এভাবেই যুথিকা হয়তো তার ব্যক্তিগত জীবনে একটু আপাত বিশ্রামের অবস্থান খুঁজে নেয়। সিঁখোর এই মন্তব্যটি কি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে না এক্ষেত্রে,

> 'She travels a hundred thousand years … before coming to an end of this painstaking journey from which not a single step can be omitted otherwise it would all be over, she would have skipped a stage in this step – by – step process.'[২৯]

কিন্তু পথচলার প্রক্রিয়া প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলতে থাকে অবিরাম। অনেকেই জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে কাঁকনবিবির মতো এ নারীর বাসযোগ্য না করে যাওয়ার বিষণ্নতা নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। আর সেই শূন্যস্থান পূরণে খুশিরা এগিয়ে আসে। লতিফারা সংগ্রামী পথচলার নতুন কৌশল তৈরি করে। খুশির দৃষ্টিতে 'কাঁটাতারের ব্যারিকেডে ফাটল' ধরার দৃশ্যকে সামনে আনেন ঔপন্যাসিক। আর লতিফা দেখে মিছিলের শেষটুকু আজ আর দেখা যায় না। অগণিত মানুষের সম্মিলিত যাত্রায় তা ভূখণ্ডকেও ছাড়িয়ে গেছে।

কোনও পরিকল্পিত শেষদৃশ্য পরিকল্পনায় উপন্যাসের ইতি টানেন না ঔপন্যাসিক সেলিনা।

> 'হাজার হাজার নারীর মাথার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে যায়। বাতাসে ঝরা পাতা বনবন ঘোরে। তুমুল বৃষ্টি নামে। পায়ের নিচে বন্যার জল গড়ায়। নদী ভেঙে ঘরহীন হয়। ... আমরা খোঁজ রাখি না। কারণ ক্ষমতা বদলে আমাদের কিছু এসে যায় না। হা-হা করে হাসে নারীরা। নারীদের হাসি বয়ে যায় বাতাসের বেগে। পৌঁছে যায় বঙ্গোপসাগরে সুন্দরবনে কেওক্রাডনের মাথায়। ওরা অফুরান শক্তি নিয়ে কাঁটাতারের বেড়ি ভাঙার কাজে নিজেদের ধরে রাখে।'[৩০]

লতিফার প্রশ্নের উত্তরে যুথিকা জানায় তাদের আরও 'পঞ্চাশ হাজার দুই সাল পর্যন্ত হাঁটতে হবে।' রাষ্ট্র-সমাজ-প্রশাসন-পরিবার যেখানে যোগ্য সম্মান দিতে পারে না নারীকে সেখানে সেই 'বাঙ্কার' বা যদি বলি এক আপাত উপনিবেশের কথা; যেখানে উপনিবেশক 'প্রভু'কে চেনা পোশাকে দেখা যায় না, অথচ এদের অদৃশ্য ক্ষমতার হাত উপনিবেশিতের ওপর সদা সক্রিয় থাকে- ঔপন্যাসিকও গাণিতিকভাবে শেষ কথা বলতে পারেন না। ফলে তাকে সেই ভয়ঙ্কর- অনভিপ্রেত- অনাকাঙ্ক্ষিত সত্যের দিকেই মুখ ফেরাতে হয়। তা না হলে যে উপন্যাসে বিবৃত ঘটনাই বলি কিংবা ক্ষমতার কেন্দ্র বিকেন্দ্রিত হতে পারে না। যা অভিপ্রেত ছিল তা হয় না বলেই ঔপন্যাসিককে সেই সম্ভাব্য মানবসত্যের দিকে তাঁর কলমকে তুলে ধরতে হয়। সেলিনাও তাই করেছেন। তাই 'চড়াগলায়

মানবতার গান' গেয়ে ইতিহাস- সমাজ বাস্তবতাকে কলুষিত না করে বরং নারীর আপন শক্তিতে সমর্থ হয়ে ওঠার মধ্য দিয়েই শিল্পের দাবি পূরণের মাধ্যমে লেখকের কঠিন দায় কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

তথ্যসূত্র

১. 'অগ্রবীজ' পত্রিকা, সাক্ষাৎকার সেলিনা হোসেন, পৃষ্ঠা ৪৭
২. দেবেশ রায়, *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*, পৃষ্ঠা ৮৬
৩. সেলিনা হোসেন, *স্বদেশে পরবাসী*, পৃষ্ঠা ১৫৪
৪. তপোধীর ভট্টাচার্য, *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*', পৃষ্ঠা ১২৩
৫. সেলিনা হোসেন, '*দিনের রশিতে গিটঠু*', পৃষ্ঠা-৩৬
৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৩
৭. Maggie Humm, *Feminist Criticism,* p. ৪৩
৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪
৯. সেলিনা হোসেন, *দিনের রশিতে গিটঠু*, পৃষ্ঠা-৫১
১০. দেবেশ রায়, *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*, পৃষ্ঠা-৩৩
১১. মালেকা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে নারী*, *পৃষ্ঠা*-৯৭-৯৮
১২. সেলিনা হোসেন, *দিনের রশিতে গিটঠু*, পৃষ্ঠা-১৫২-৫৩
১৩. সুমিতা চক্রবর্তী, *ইতিহাস চিহ্নিত সাহিত্য*, মুখবন্ধ-'বই প্রসঙ্গে কিছু কথা'
১৪. সেলিনা হোসেন, *দিনের রশিতে গিটঠু*, পৃষ্ঠা-৫২
১৫. Graham Allen, *Intertexuality,* p. ৩৫
১৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫-৩৬
১৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬
১৮. সেলিনা হোসেন, *দিনের রশিতে গিটঠু*, পৃষ্ঠা-৫৫-৫৬
১৯. Helen Cixous, *Authorship, Autobiography of Love,* p. ০১
২০. সেলিনা হোসেন, *দিনের রশিতে গিটঠু*, পৃষ্ঠা-৫৪
২১. সেলিনা হোসেন, *দিনের রশিতে গিটঠু*, পৃষ্ঠা-৫৪
২২. Helen Cixous, *Rootprints,* p. ৯০
২৩. সেলিনা হোসেন, *দিনের রশিতে গিটঠু*, পৃষ্ঠা-৬৩
২৪. Maggie Humm, *Feminist Criticism,* p. ০৭
২৫. সেলিনা হোসেন, *দিনের রশিতে গিটঠু*, পৃষ্ঠা-১০৩
২৬. Maggie Humm, *Feminist Criticism,* p. ০৭
২৭. সেলিনা হোসেন, *দিনের রশিতে গিটঠু*, পৃষ্ঠা-৭৪
২৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭১
২৯. Helen Cixous, *Authorship, Autobiography and Love,* p. ১৭
৩০. সেলিনা হোসেন, *দিনের রশিতে গিটঠু*, পৃষ্ঠা-১৭৫

গ্রন্থঋণ

আকরগ্রন্থ

সেলিনা হোসেন, *দিনের রশিতে গিটঠু*, মাওলা ব্রাদার্স, ২য় মুদ্রণ, ঢাকা, ২০১৪

সহায়ক গ্রন্থ (বাংলা)

সুমিতা চক্রবর্তী, *ইতিহাস চিহ্নিত সাহিত্য*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৬

মালেকা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে নারী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১

তপোধীর ভট্টাচার্য, *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*, অমৃতলোক, কলকাতা, ২০০২ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

দেবেশ রায়, *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬

সেলিনা হোসেন, *স্বদেশে পরবাসী*, জনতা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০

সহায়ক গ্রন্থ (ইংরেজি)

Allen, Graham, *Intertexuality,* Routledge, New York, 2007

Cixous, Helen, *Authorship, Autobiography and Love* (Susan Seller), Polity Press, Cambridge, 1996

Cixous, Helen, and Mireille Caralle Gruber, *Rootprint (Memory and Lifewriting),* Routledge, New York, 1997

Humm, Maggie, *Feminist Criticism Woman A Contemporary Critics,* Harvester Wheatsheaf, Hertfordshire, 1986

পত্রিকা

'অগ্রবীজ' (৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা), সুবিমল চক্রবর্তী (সম্পা), টেক্সাস, ২০০৯

'গল্পকথা' (৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা), চন্দন আনোয়ার (সম্পা), রাজশাহী, ২০১৫